The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 15, No. 29-30, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলা ফলাচিহ্ন ও উচ্চারণমূলক বানানের পারস্পরিকতা অন্বেষণ

তারিক মনজুর*

Abstract: Various applications of dependent consonants can be noticed in medieval Bengali language. Dependent consonants have been added to modern Bengali words as Sanskrit words, although they follow 'Prakrit' in pronunciation. As a result, similar words in Bengali are similar in appearance to Sanskrit words but have different characteristics in pronunciation. It is believed that these dependent consonants are the biggest obstacle in pronouncing the Bengali spelling. Moreover, in the case of spelling, different rules have to be made for Sanskrit words and non Sanskrit words mainly due to these dependent consonants. This article presents the views and arguments of various scholars of the modern age regarding the use of dependent consonants on Bengali words. Institutional decisions have also been taken into consideration. The shape, pronunciation, application variety and spelling of the dependent consonants are discussed in context. At the end of the discussion, an opinion has been given on how the dependent consonants can be integrated in the case of Bengali pronunciation and spelling.

চাবি-শব্দ : বাংলা ফলাচিহ্ন, ফলাচিহ্নের আকৃতি, ফলাচিহ্নের উচ্চারণ, ফলাচিহ্নের বৈচিত্র্য, মধ্যযুগের পুথি, উচ্চারণমূলক বানান, তৎসম ও অতৎসম শব্দ

১. ভূমিকা

বাংলা বানানে তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের ভেদ ঘুচানোর ক্ষেত্রে ফলাচিহ্নগুলো প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন সময়ে অনেক পণ্ডিত এসব ফলাচিহ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। বানান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রকাশের ক্ষেত্রেও ফলাচিহ্নের জন্য আলাদা করে ভাবতে হয়েছে। এই আলোচনায় বাংলা ফলাচিহ্নের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণগত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; ফলাচিহ্ন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অভিমত ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তৎসম ও অতৎসম শব্দের বানানে এগুলো কীভাবে সমন্বিত থাকতে পারে, তার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভাষার জন্য বৈপ্লবিক এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি; বরং ফলাচিহ্নের প্রচলিত আকৃতি ও উচ্চারণকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. তাত্ত্বিক ধারণা

ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে; যেমন – ন-ফলা (্ন), ব-ফলা (্ব), ম-ফলা (্ম), য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), ল-ফলা (্ল) (সরকার ও অন্যান্য, ২০২০: ১৩)।

হানা রুথ টমসন ফলাচিহ্নগুলোকে অনুবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (টমসন, ২০২১: ৬৮); তিনি অবশ্য রেফ (র্) চিহ্নকেও এসব অনুবর্ণের অন্তর্গত করেছেন।

হায়াৎ মামুদ ফলার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

> ব্যঞ্জনবর্ণের বা যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের নিচে আরেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হলে যে-বর্ণটিকে যোগ করা হল তাকে 'ফলা' বলা হয়। যেমন ণ-ফলা, ন-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা। এই সব -ফলা সহযোগে কিছু শব্দের উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ণ-ফলা (অপরাহ্ণ, তীক্ষ্ণ); ন-ফলা (অগ্নি, স্নান); ব-ফলা (উদ্বেল, দ্বিতীয়); ম-ফলা (যুগ্ম, লক্ষ্মী); র-ফলা (প্রাণ, ত্রাস); ল-ফলা (অম্ল, শুক্লা)। য-ফলার চেহারা কিন্তু অন্য রকমের (্য) এবং তা ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে না-বসে ডান পাশে বসে – নিত্য, স্বাচ্ছন্দ্য, বাহ্য, ব্যাধি। (মামুদ, ২০০০: ২-৩)

এসব ফলাচিহ্ন উচ্চারণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ করে। বিশেষ করে ম-ফলা, য-ফলা ও ব-ফলা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এগুলোকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এভাবে:

> ম-ফলা যোগে বর্ণের দ্বিত্ব এবং কখনও দ্বিত্ব ও তাহার অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন – পদ্ম (= পদ্‌দঁ), ছদ্ম (= ছদ্‌দঁ), বিস্ময় (= বিশ্‌শয়), লক্ষ্মী (= ল'ক্‌খী), লক্ষ্মণ (= লক্‌খন্)। শব্দের আদিতে ম-ফলা যোগে কেবল অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। যেমন – স্মিত (=শিঁত')। শ্মশান (= শঁশান্), শ্মশ্রু (= শঁস্রু)। অনুনাসিক বর্ণ ও অন্তঃস্থ বর্ণের সহিত যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা – বাঙ্ময়, চিন্ময়, বাল্মীকি।
>
> য-ফলা যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন – বাক্য (= বাক্‌ক'), গণ্য (= গ'ন্‌ন'); কখনও কখনও য-ফলার 'জ'-এর ন্যায় পৃথক উচ্চারণ হয়। যথা – উদ্যোগ (= উদ্‌জোগ্); কিন্তু উদ্যান (= উদ্দান্)। য-ফলার সহিত আকার থাকিলে বিকৃত এ-কারের ন্যায় উচ্চারণ। যেমন – ব্যায়াম (= বে'য়াম্), ত্যাগ (= তে'গ্), অভ্যাস (= অব্‌ভেশ্)।
>
> ব-ফলা যোগে বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা – পক্ব (= পক্‌ক'), নিক্বণ (= নিক্‌কন্)। কোনও কোনও স্থলে ব-ফলার 'ব'-এর উচ্চারণ হয়। যথা – উদ্বেগ (=উদ্‌বেগ্)। শব্দের আদিতে ব-ফলার কোনও উচ্চরণ নাই। যেমন – দ্বার (দার্), দ্বি (= দি)। (শহীদুল্লাহ্, ২০০৮: ৩৩)

ফলাচিহ্নের এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কিংবা নিয়ম প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নিতে হয়েছে।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রমিত বাংলা বাননের নিয়ম (২০১২) পুস্তিকায় বাংলা একাডেমি তৎসম শব্দের ও অতৎসম শব্দের জন্য পৃথক নিয়ম প্রণয়ন করেছে। কিন্তু বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভাজনের বিপক্ষে একটি মত দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে, সময় হয়েছে বানানে তৎসম-অতৎসমের পার্থক্য ঘুচানোর। ফলাচিহ্নগুলোর প্রয়োগ ও উচ্চারণকে বিবেচনায় নিয়েই তা করা সম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের অভিমত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, ফলাচিহ্নের বিদ্যমান আকৃতি বজায় রেখে বাংলা বানানকে সমন্বিত করা যায়। এই গবেষণা-প্রবন্ধের সুপারিশমালায় তা নির্দেশ করা হয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন ও যাচাই করা হয়েছে। ফলে, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এখানে বর্ণনামূলক-ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য-সংগ্রহের উৎস হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, যেখানে ফলাচিহ্ন বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

৫. মধ্যযুগের পুথিতে ফলাচিহ্নের ব্যবহার

মধ্যযুগের হস্তলিখিত পুথিতে ফলাচিহ্নের বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪: ৮৮) লিখেছেন, মধ্যযুগের বাংলা বানান অনেকটা প্রাকৃত-প্রভাবমুক্ত হয়ে আসে। এর কারণ মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে সংস্কৃতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। ওই সময়কার অধিকাংশ আখ্যায়িকাও ছিল পৌরাণিক। তখনকার কোনো পুথি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত শব্দ প্রায় সমপরিমাণে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এ সময়কার লিপিকরগণ বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় যত্নবান হয়েছেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বাংলা বানানরীতির ধারাকে মোটামুটি এভাবে নির্দেশ করা যায়। এর প্রধান কারণ, চৈতন্যচরিতকারের সবাই সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দের ব্যাপক ব্যবহার ও সেগুলোর বানানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাদের যত্ন ও চেষ্টা স্বাভাবিক। এভাবে ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাবের পূর্বেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সেগুলোর বানানের শুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা বাংলা ভাষায় বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

বাংলা বানানরীতিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী বানান, (২) উচ্চারণ-অনুগ বানান। এই দুই ভাগের বাইরে আরেকটি বানারীতি প্রচলিত, সেটি হল প্রথার অনুকরণ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রচয়িতা বা লিপিকর যেভাবে লিখে গেছেন, তারই অনুবর্তন করা। মধ্যযুগে বাংলা পুথি লেখার সময় থেকেই সংস্কৃত শব্দের বানান মূল সংস্কৃতের অনুসরণে লেখা হয়েছে (সেন, ১৯৭৫: ২৬); যেমন, 'বিশ্ব' শব্দের বাংলা উচ্চারণ 'বিশ্‌শ' হলেও মূলানুগভাবে লেখা হয়েছে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগে

রচিত গ্রন্থ লিপিকরদের মাধ্যমে অনুলিখিত হয়ে প্রচারিত হত। এভাবে প্রতিলিপি থেকে প্রতিলিপি তৈরির সময় উচ্চারণ-অনুগ বানান চালু হয়। তাছাড়া প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে কথ্যশব্দের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আর এই শব্দগুলোর বিশেষত্ব এই যে, কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হতো বলে এগুলোর বানান উচ্চারণ অনুযায়ী গঠিত (পাল, ১৯৬৪: ২২)। বানানে প্রথার অনুকরণও করা হয়েছে অনেক সময় – তা ব্যুৎপত্তি বা উচ্চারণ কোনোটিকে মান্য না করেই। 'পল্লব' লিখতে গিয়ে 'পল্ব' ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য স্থানে। একইভাবে 'প্রফুল্ল' লিখতে 'প্রফুল্ব', 'মাল্লা' লিখতে গিয়ে 'মাল্বা' ব্যবহৃত হয়েছে (মিয়া, ১৯৯৪: ৯১)। মধ্যযুগে ফলাচিহ্নের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটেছে; এগুলো নিচে দেখানো হলো।

৫.১ ফলা-রূপে উ-কার নির্দেশক 'ব'

সুকুমার সেন (১৯৭৫: ২১২) দেখিয়েছেন, সংস্কৃত শব্দ 'দ্ব' থেকে প্রাকৃত বাংলায় 'দু' হয়েছে। একইভাবে 'ধ্বনি' থেকে 'ধুনি', 'স্বাদ' থেকে 'সুআদ' হয়েছে। শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪: ৯২) একে বলছেন 'ফলা-রূপে উ-কার নির্দেশক – ব'। অর্থাৎ সংস্কৃত ব-ফলা থেকে বাংলা তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে উ (/ঊ) স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে। মূল সংস্কৃত উচ্চারণে অন্তঃস্থ-ব এবং স্বরধ্বনি 'উ'-এর একই রকম উচ্চারণরীতির কারণে প্রাচীন বাংলা পুথিতে উ-কার নির্দশক ব-ফলার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়:

দ্ব (দু) – 'কৃষ্ণ কথা ষুন নর ঘুচিবে দ্বর্গতি।' পৃ ২৩ ক, ৬০৫৩ সং ঢাবিপু[১]
ন্ব (নু) – টংকারিয়া ধন্ব গুন এড়ে দিব্ব বান।' পৃ খ, ৫৭৪৬ সং ঢাবিপু
ম্ব (মু) – 'দক্ষিণে নির্ম্মাণ কৈলা বরাহ ম্বরতি ॥' পৃ ১৮ক, ৬০৫৩ সং ঢাবিপু

৫.২ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'ব'

'ঈশ্বর', 'বিশ্ব', 'অশ্ব' – এসব শব্দের 'শ্ব' বাংলায় 'শ্‌শ'-রূপে উচ্চারিত হয়। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃতের 'শ্ব'-এর রূপ 'স্‌স' বা 'শ্‌শ' (সুনীতিকুমার ১৯৭৫: ১০৮)। সংস্কৃত-অনুযায়ী উচ্চারিত না হয়েও এসব শব্দ প্রাচীন পুথিগুলোতে কেন মূল সংস্কৃত বানানেই লেখা হতো, সে কথার জবাব এদেশে অব্যাহত সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস থেকে উদ্ধার করা যায়। বানান ও উচ্চারণের সংকর-সত্তায় লালিত এই 'শ্ব'-স্থিত ব-ফলা কয়েকটি শব্দে সীমিত বানান থেকে অভ্যস্ততার কারণে পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে সঞ্চালিত হয়ে পড়েছিল (মিয়া, ১৯৯৪: ৯৪):

জ্ব (জ্‌জ) – 'গর্ভবতী শকুন্তলা লজ্বিত হৃদয় ॥' পৃ ৮খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু
ত্ব (ত্‌ত) – ইসত হাসিয়া তবে দিলেন উত্বর ॥' পৃ ১১খ, ৫৯৪৭ সং ঢাবিপু
ন্ব (ন্‌ন) – 'ব্রাহ্মনে বোলেন আমি অন্ব বিনে মরি।' পৃ ২খ, ৬০৪২ সং ঢাবিপু

৫.৩ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'ম'

শাহজাহান মিয়া (১৯৯৪: ৯৫) দেখিয়েছেন, ৬০৪১ সংখ্যক ঢাবিপু-তে ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানানে লেখা 'পদ্মা' যেমন রয়েছে (পৃ ৮৭খ), তেমনি উচ্চারণানুগ বানানে 'ছদ্দ' (ছদ্ম)-ও লিখিতে হয়েছে (পৃ ১২৯ক)। এতে মনে করা যায়, 'দ্ম' ও 'দ্দ'-এর উচ্চারণ বাংলার অভিন্ন। 'ভীষ্ম', 'গ্রীষ্ম', 'ভস্ম', 'পদ্ম', 'আত্মা' শব্দের ম-ফলা বাংলা উচ্চারণে মূলত দ্বিত্বনির্দেশক। প্রাচীন বাংলা পুথিতে দ্বিত্বনির্দেশক এ রকম ম-ফলার ব্যবহার রয়েছে (মিয়া, ১৯৯৪: ৯৬):

স্ম (শ্‌শ < শ্ব) – 'বিস্তর বিলাপি তবে আস্মে আরোহিয়া।' পৃ ৪৮খ, সা ৩৮৫ সং ঢাবিপু

দ্ম (দ্‌দ < দ্য) – 'পঞ্চশব্দে বাদ্ম বাজে আনন্দ মঙ্গলে।' পৃ ৭৬ক ৬০৪১ সং ঢাবিপু

স্ম (শ্‌শ < স্ব) – 'বাল বৃদ্ধ জুবা গৃহী জতেক তপস্মি ॥' পৃ ৫খ, ৬০৯৫ সং ঢাবিপু

৫.৪ ফলা-রূপে দ্বিত্বনির্দেশক 'য়'

প্রাচীন লিপিকরের কাছে য়-ফলা চিহ্নটি ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট বর্ণের দ্বিত্বনির্দেশক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। অভ্যস্ততার কারণে এটি সঞ্চালিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ব্যুৎপত্তি-অনুসারী বানানে যেমন য-ফলা ছিল, তেমনি ভিন্নতর শব্দেও ব্যবহৃত হয়েছে। (মিয়া, ১৯৯৪: ৯৬)

উদাহরণ:

গ্য (গ্‌গ < জ্ঞ) – 'পাইআ পিতার আগ্যা আইলু তুমা কাছে।' পৃ ১৭ক, ২৮০৭ সং ঢাবিপু

ত্য (ত্‌ত < ত্ত) – 'পুরন্দরে অহল্লার ভাঙ্গিল সতিত্য।' পৃ ৬৬খ, ৬০৪১ সং ঢাবিপু

দ্য (দ্‌দ < দ্ব) – 'বিদ্যানের হস্তে গেলে উদ্ধারিব তাকে।' পৃ ১১৭খ, ৬১০০ সং ঢাবিপু

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০: ৪৯) লিখেছেন, যুক্তব্যঞ্জনে যোজ্যমান ব্যঞ্জনগুলোর যথাযথ সন্নিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব পুথির বানানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, বর্ণবিন্যাসে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা শুধু যে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, বাংলা পুথিতে উদ্ধৃত সংস্কৃত রচনাংশের বানানেও এই স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ স্পষ্ট। তবে বাংলা পুথির বানানে যে ধরনের বিশৃঙ্খলা রয়েছে, সংস্কৃত পুথির বানানে ততটা নেই। সংস্কৃত প্রথম থেকেই ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ সুসংগঠিত একটি লেখ্য ভাষা। এর বানান ও বর্ণ বিন্যাসের নিয়মাবলিও তাই প্রথম থেকেই একটি অনমনীয় মান্যতার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৬. সংস্কৃত বনাম বাংলা

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অসরল এবং দ্বিস্তরিক। বাংলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা – এর ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-বাক্যগঠন-শব্দভাণ্ডার সবই আলাদা। অন্যদিকে বাংলার সঙ্গে

সংস্কৃতের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, অন্তত এ কারণে যে এর শব্দভাণ্ডারের একটি বিপুল অংশ সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে নেয়া। যে-কারণে এই শব্দগুলোকে বলা হয় তৎসম। তাছাড়া সন্ধি-সমাস-উপসর্গ-প্রত্যয় ইত্যাদি নানা সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা বানানের সংযোগ রয়েছে। অথচ বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উচ্চারণ প্রায়শ মূলের মতো নয়। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই' (ঠাকুর, ২০১২/১৬: ৪৫৩)।

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫: ৩২৩) বলছেন, সংস্কৃত আর বাংলা নিশ্চয়ই দুটো আলাদা ভাষা, ঠিক যেমন সন্তান বাবা-মায়ের থেকে আলাদা – পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু প্রথমত, বাংলালিপি নাগরি-বংশোদ্ভূত; এই লিপিতে স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত লেখা যায়, এবং লেখা হত; তাই সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার বন্ধনটা দৃঢ়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এত বেশি তৎসম আর তদ্ভব শব্দ আছে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে অচ্ছেদ্য।

ব্যুৎপত্তিগত বানান আমাদেরকে সংস্কৃত-মুখাপেক্ষী করে রেখেছে; অথচ বাংলা ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি। আত্মা, পদ্ম – এ রকম অসংখ্য বানান আমরা সংস্কৃত অনুসারে লিখলেও উচ্চারণ করি বাংলায়। বাংলা বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

> বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি, কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনই সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়। (ঠাকুর, ২০১২/১৩: ৫৯৯)

মোহাম্মদ আজম বলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত গদ্যগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ধার করা হয়েছে। এসব শব্দ লেখা হয়েছে সংস্কৃতরীতিতে। তাতে বানানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বানান হয়ে উঠেছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি-অনুসারী। অথচ মধ্যযুগে বাংলা বানান ছিল মূলত উচ্চারণ-অনুসারী। তিনি মনে করেন, সমস্যা আরও বড় হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের শুরুতেই যখন প্রচলিত 'তৎসম' শব্দগুলোর মধ্যযুগে-প্রচলিত রূপকে বিবেচনায় না নিয়ে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে বানান ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া তদ্ভব ও অন্য শ্রেণির শব্দের ক্ষেত্রেও বানানকে সংস্কৃত-অনুসারী করার প্রবণতা ছিল অতি প্রবল। (আজম, ২০১৪: ১৭৪)

এই প্রবণতা উচ্চারণের সঙ্গে বানানের ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে – এমনকি সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেও। কারণ, সংস্কৃত অনুযায়ী এই বানান ঠিক করা হলেও বাঙালির উচ্চারণে শব্দগুলোর উচ্চারণের রূপ বদলে গেছে। 'As regards the pronunciation of these Sanskrit words, an extraordinary state of

affairs exists – paralleled, I believe, in no other language in the world.' – এ মন্তব্য গ্রিয়ার্সনের (Grierson ১৯০৩: ১৪)। বাংলা শব্দের উচ্চারণ ও বানানের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কিংবা বানান বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই ছদ্ম-সংস্কৃতায়ন তৈরি করেছে দীর্ঘমেয়াদি সংকট।

৭. ফলাচিহ্ন বিষয়ক বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিমত

বাংলা ফলাযুক্ত শব্দের উচ্চারণ প্রাকৃত-অনুসারী। বাংলা বানান ও বাংলা উচ্চারণের গরমিল নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডও লক্ষ করেন। তিনি বলেন: বাংলা বানানে ও উচ্চারণে – উভয় ক্ষেত্রেই 'বর্গীয় ব' ও 'অন্তঃস্থ ব'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই (ব wo, in the Shanscrit language is always uded with the sound of w, but in the Bengalese is never distinguished from ৰ bo either in form or utterance)। (Halhed ১৭৭৮: ১৩-১৪)

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৪: ৫৪৫) য-ফলা এবং ব-ফলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত-অনুগ মূল বানান লেখার পক্ষপাতী। তিনি ব্যুৎপত্তিমূলক বানানকে মান্য করতে বলছেন। উচ্চারণমূলক বানানের সমস্যা হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, অঞ্চলবিশেষে উচ্চারণের রূপ বদলে যায়। সতীশচন্দ্র ঘোষও (১৯৮৪: ৫৪৯) শব্দের বানানকে উচ্চারণমূলক করতে চান না, ব্যুৎপত্তিমূলকই রাখতে চান। সতীশচন্দ্র মনে করেন, ব্যুৎপত্তিমূলক বানান অর্থ-উপলব্ধির জন্যও সহায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চারণমূলক বানানের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কেবল বানানের জোরেই বহু শব্দ 'তৎসম' সেজে আছে। তিনি মনে করেন, 'বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব, কিন্তু লেখবার সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ।' (ঠাকুর ২০১২/১৬: ৪৩২)

যাঁরা ব্যুৎপত্তি-অনুসারী বানানের পক্ষপাতী, তাঁদের প্রধান যুক্তি – উচ্চারণানুগ বানান আসলে অসম্ভব। দেবপ্রসাদ ঘোষ (২০০৭: ১৩৯) রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে যুক্তি দেখাচ্ছেন, প্রচলিত বানানের সংস্কারে 'শৃঙ্খলা' নষ্ট হয়, কিন্তু বানান 'উচ্চারণানুগ' হয় না।

বানান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা বানানকে উচ্চারণের সঙ্গে সমন্বিত করা। বলা যায়, তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা অনেকাংশে পরবর্তী বানান-সংস্কার প্রয়াসের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে (সরকার, ২০০৪: ১৩৩)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের প্রভাবশালী যাবতীয় বানানবিধিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে অনুসৃত হয়েছে। আজম (২০১৪: ৪৬৩) মনে করেন, বাংলা বানান-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের সমন্বিত ও বিশ্লেষণাত্মক পাঠ অদ্যাবধি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই যে ভাষার লিপি মুখ্যত তার উচ্চারণ প্রকাশের জন্যই গঠিত হয়েছে। উচ্চারণ ও বানানে একটা অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকবেই। সেজন্য, একেবারে কথ্যভাষার উচ্চারণের প্রতিচ্ছায়া হবে – কোনো ভাষার লিপি ও বানান, এ রকম মনে করে বাংলা ভাষার প্রচলিত বানানকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা বোকামি। উচ্চারণের ও বানানের অসামঞ্জস্য বহু শতকের অভ্যাসে মানুষ মেনে নিয়েছে, এ রকম বানান সয়েও গেছে। ফলে, 'লক্ষ্মী' বানানের বদলে 'লোক্খি', 'সহ্য' বানানের বদলে 'শোজ্ঝো' গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

সুধীর মিত্র (২০০৭ : ৩৭) বলেন, অনেকক্ষেত্রে ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; যেমন আমরা 'শ্মশান'-কে বলি 'শশান'। এক্ষেত্রে 'শশান' বানানের পক্ষপাতী তিনি। সংস্কৃতে 'পদ্ম'-কে পড়া হয় 'পদ্‌ম' (অ); বাংলায় পড়া হয় 'পদ্দঁ'। শেষোক্ত বানানটি পূর্ব্বোক্ত বানান অপেক্ষা সরল নয়, এজন্য 'পদ্ম'-কে তিনি 'পদ্‌ম' লেখার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, সংস্কৃত শব্দবহুল হলেও বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নয়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খলে বাংলাকে চিরদিন আবদ্ধ করে রাখার কোনো কারণ নেই।

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব (২০০৭: ৫৮) লিখেছেন: লক্ষ্মণ, উজ্জ্বল, মহত্ত্ব, মন্ত্র, উর্দ্ধ, বস্ত্র ইত্যাদি শব্দের বানান হবে যথাক্রমে – লখ্যন, উজ্যল্‌, মহত্য, মন্‌ত্র, উর্‌ধ, বস্‌ত্র। ব-ফলা রাখাও অনাবশ্যক মনে করছেন তাঁরা। কারণ অধিকাংশ শব্দে ব-ফলা অনুচ্চারিত থাকে; যেমন – স্বাধীন, শ্বেত, স্বজন, দ্বীপ, স্বর্ণ, স্বর ইত্যাদি। যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে উদ্যানের মতো 'য' ফলাতেই কাজ চলবে; যেমন – 'বিদ্যেষ', 'অষ্য', 'বিদ্যান' ইত্যাদি। 'ন' ফলারও প্রয়োজন নেই কারণ 'বিষন্য' 'অন্য' ইত্যাদি 'য' ফলাতেই চলবে। তাঁদের প্রস্তাবে 'ভস্ম' হয়ে যাবে 'ভস্যঁ', 'পদ্ম' হয়ে যাবে 'পদ্যঁ'।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৭০: ১৬৭) বানানকে অধিকতর ধ্বনি-অনুসারী করতে চেয়েছেন। জ্বালা, শ্বাস, শ্বাপদ প্রভৃতি শব্দের গোড়ায় বাংলা ব-ফলার যেখানে কোনো উচ্চারণ নেই, সেখানে তিনি ব-ফলা ফেলে দিতে বলেছেন। তবে শব্দের মাঝখানে অন্বয়, বিশ্ব, বিল্ব, নিশ্বাস, আশ্বাস প্রভৃতি শব্দের ব-ফলা অবিকৃতরূপে রাখতে বলেছেন। শ্মশান এবং পদ্ম প্রভৃতি ম-ফলা সম্বলিত শব্দে যেখানে ম-এর কোনো উচ্চারণই নেই, সেখানে শশান এবং পদ্দ এবং আত্মা, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দে যেখানে ম-ফলা পূর্বস্বরকে অনুনাসিকৃত করে সেখানে আঁত্‌তা, মহাঁত্‌তা লেখা এবং গুল্ম, বল্মীক, কাশ্মীর প্রভৃতি শব্দে ম-ফলা অক্ষুণ্ন রাখা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তৎসম শব্দে য-ফলা (য) এবং ব-ফলা যেখানে উচ্চারণে দ্বিত্ববোধক সেখানে তারা অব্যাহত থাকবে, যেমন – সভ্য, বাল্য, বাক্য, আশ্বাস, বিদ্বান, সত্বর ইত্যাদি। কিন্তু উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখানে তাদের উচ্চারণ পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদবেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে। শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ, প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব-ফলার কোনো উচ্চারণই বাংলায় নেই, সেখানে ব-ফলা ছাড়াই শাপদ, শাশ, লেখা বিধেয়। স্বত্ব, স্বত্বাধিকারী এবং সত্ত্বেও প্রভৃতি শব্দেও পূর্ব নিয়ম ব্যবহার্য কিন্তু সত্ত্বেও শব্দে ত্ত ব্যবহার না করে

ত্ব-ফলা ব্যবহার করলেই চলবে। প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী এ শব্দগুলোর বানান হবে শত্ব, শত্বাধিকারী এবং শত্বেও ইত্যাদি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৮৪: ৫৯৩) বাংলা বর্ণমালাকে খানিক ধ্বনিমূলক করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলছেন, পালি এবং প্রাকৃতে এইরূপ ধ্বনিমূলক বানান ছিল। সংস্কৃতসম শব্দে য-ফলা ও ব-ফলা দ্বিত্ব উচ্চারণের জায়গায় থাকবে (বাক্য, বিদ্বান)। কিন্তু যেখানে য-ফলার উচ্চারণ য এবং ব-ফলার উচ্চারণ ব, সেখানে পৃথক লেখা দরকার (উদ্‌যাপন, উদ্‌বাহু)। সংস্কৃতসম শব্দে র-ফলা, রেফ এবং ল-ফলা থাকবে। র-ফলার সঙ্গে যুক্তাক্ষর স্পষ্ট লিখতে হবে (বক্র, ত্রাণ)। সংস্কৃত শব্দগুলোকে ধ্বনিমূলকভাবে লেখার দরকার নেই। শহীদুল্লাহ বর্ণমালা ও বানানকে ধ্বনিমূলক করতে চাইলেও বানানরীতির আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। তাই সংস্কৃত শব্দকে যথাবৎ ব্যুৎপত্তিমূলক রাখতে চান।

জ্যোতিভূষণ চাকির (২০০৭: ২৫৭) কাছে তৎসম-অতৎসম বিভাজন গ্রাহ্য নয়। তিনি লিখেছেন, যে শব্দশ্রেণির বানান বদল হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে অতৎসম। কিন্তু ২১ কোটি বাঙালির শতকরা পাঁচ জনও সংস্কৃত শব্দকে শনাক্ত করতে পারবে কি না সন্দেহ।

পবিত্র সরকার (২০০৪: ৩৮-৩৯) লিখেছেন: তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো – তা কতটা ব্যুৎপত্তি-অনুসারী হবে, আর কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে তা নির্ধারণ করা। লেখক এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, ক্রমশ বানান ধ্বনিসংবাদী হচ্ছে। তিনি নিজেও মনে করেন, এই প্রবণতা 'অনিবর্তনীয়' এবং 'অপ্রতিরোধ্য'। ক্রমশ এ জাতীয় সমস্ত শব্দের বানানেই উচ্চারণের অধিকার বিস্তার লাভ করবে। ফলাচিহ্নগুলোর অস্বচ্ছতা দূর করে সেগুলোকে স্বচ্ছ করা দরকার।

বাংলা বর্ণ-সংস্কার ও বানান-সংস্কারের সূত্র ধরে ফলাচিহ্নগুলোর বিষয়ে নানারকম ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। এসব অভিমতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ফলাচিহ্নগুলো বানানে বিদ্যমান থাকবে কি না, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিমূলক বানান হবে কি না, (২) ফলাচিহ্নের বদলে বানানকে পুরোপুরি উচ্চারণমূলক করা যায় কি না এবং (৩) ফলাচিহ্নগুলো যেসব শব্দে উচ্চারিত হয় না, সেসব শব্দে এগুলোকে বাদ দেওয়া যায় কি না।

৮. ফলাচিহ্ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অভিমত

উনিশ শতকের শুরুতে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে, পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাংলা বানানের একটা 'মান' বা 'স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি হয়। এ সময় সংস্কৃত শব্দের মূল বানান অনুযায়ী বাংলা বানানকেও ব্যুৎপত্তিমূলক করে তোলা হয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের আধিপত্য কমে আসে এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহার বাড়তে থাকলে অসংস্কৃত শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় (হুমায়ূন ১৯৮৪: ৬৪৮)। পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি তাই নিবদ্ধ হয় বানান সংস্কারের দিকে। বিশ্বভারতীর (১৯২৫) উদ্যোগে চলতিভাষার বানান সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি গৃহীত হয়। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৫) বানান কমিটি গঠন করে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। এসব উদ্যোগে ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে অভিনব কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। প্রচলিত রূপকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সরকার মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় 'East Bengal Language Committee' গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্টে ছিল: ফলা চিহ্ন থাকবে না। র-ফলা, রেফ, ন/ণ-ফলা, ল-ফলা থাকবে না; উচ্চারণ অনুসারে ভেঙে লিখতে হবে। উচ্চারণ ও লিখন যথাসম্ভব এক হবে; অক্ষরগুলো গোটা গোটা থাকবে; শব্দের সহজতম বানান গ্রহণ করতে হবে; অনুচ্চারিত অক্ষর লিখিত হবে না, সংযুক্ত অক্ষর ভেঙে পাশাপাশি গোটা গোটা বসাতে হবে; সব ফলাচিহ্ন উঠে যাবে। যেমন: বীশ্‌শ, পদ্‌দা, বীদ্‌দান, চন্‌দ্‌র, প্‌রান, গ্‌লানী, প্‌রায়, রুগ্‌ন।

১৯৬২ সালে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে বাংলা একাডেমি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসঙ্ঘ গঠন করে (চৌধুরী ১৯৭০: ১১০)। উপসঙ্ঘ বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার সম্পর্কে কিছু বিধি সুপারিশ করে। সুপারিশগুলো ছিল এ রকম: বাংলা বানান সাধারণত সংস্কৃত বানানের অনুসরণে লিখিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যেসব ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিপিবদ্ধ করা হয়, বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সেইসব উচ্চারণ অনুসৃত হয় না। অধিকন্তু বাংলা উচ্চারণও ধরা পড়ে না। যেমন – সহ্য, বাহ্য, শ্বাস, বিশ্ব, বাক্য, লক্ষ্মণ, স্মিত, মহাত্মা প্রভৃতি শব্দ। এটা অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে ্র (র-ফলা) এবং র্ (রেফ) থাকবে। প্রচলিত বাংলা বানানে যেখানে সেখানে ্য-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বোঝায় কেবল সেসব স্থানেই দ্বিত্ব বোঝাতে হলে ্য-ফলা রক্ষিত হবে। কিন্তু যেসব স্থানে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়, যেমন – বাহ্য, উহ্য সেখানে ধ্বনি-অনুযায়ী ্য-ফলা থাকবে না; যেমন – বাজ্‌ঝ, উজ্‌ঝ। যুক্তাক্ষরে কোনো অক্ষরের চেহারা পরিবর্তিত হবে না; যেমন: ক্র। দ্বিত্বের জন্য ব-ফলা থাকবে না, ম-ফলা থাকবে না; তবে ল-ফলা থাকবে।

এনামুল হক, আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী সুপারিশমালার বিরোধিতা করে 'ভিন্নমতপোষক টীকা'য় মন্তব্য করেন। তাঁরা বলেন, 'প্রস্তাবের কোন কোন অংশ ক্ষতিকর বলিয়া মনে না করিলেও আমরা সামগ্রিকভাবে এই প্রস্তাবসমূহের পূর্ণ বিরোধিতা করি' (চৌধুরী ১৯৭০: ১৯৯)। কেন করেন, এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। সবশেষে তিন জন বলেন, সহ্য-অসহ্যের হ্য, পদ্মা-ছদ্মের দ্ম, জন্ম-আত্মের ন্ম বা ত্ম,

বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা লম্ব-লম্বার ব-ফলা ইত্যাদি বর্জনীয় নয়। সহ্য-অসহ্যের পরিবর্তে সজ্ঝ-অসজ্ঝ, পদ্মা-ছদ্মের পরিবর্তে পদ্দাঁ-ছদ্দঁ, জন্ম-আত্মের পরিবর্তে জন্ম-আত্তঁ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরিবর্তে বিশ্শাস অবিশ্শাশ লিখলে বানান হিসাবে কেন সহজতর বিবেচিত হবে, এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাছাড়া, ধ্বনিগতভাবে এসব সমীকরণ ঠিক নয় বলে তাঁরা মনে করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে কুমিল্লার বার্ড (BARD)-এ 'পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান' শীর্ষক একটি কর্মশালা করে (চৌধুরী ১৯৯৪: বারো)। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ হবে; কিন্তু যেসব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে (ক্ষ, জ্ঞ, ক্ষ্ম), সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে।

১৯৯২ সালে *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* শিরোনামে বাংলা একাডেমি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এখানে তৎসম শব্দের ও অতৎসম শব্দের আলাদা নিয়ম করা হয়। তৎসম শব্দের নিয়মে আছে: যুক্তব্যঞ্জনগুলো যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে; যেমন: গু, দ্রু, ত্র, ভ্র।

অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংসদ বানান অভিধান* (১৯৯৮)-এ বানানের নিয়ম দেয়া হয়েছে। নিয়মগুলো এ রকম: উদ্ (উৎ), সৎ (সদ্), প্রাক (প্রাগ্), দিক (দিগ্), বাক্ (বাগ) প্রভৃতি আগে থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দের যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা যেতে পারে। যেমন: উদ্যাপন, উদ্বিগ্ন, দিগ্বিজয়। কিন্তু যুক্তবর্ণে 'ব' ধ্বনির উচ্চারণ না থাকলে যুক্তবর্ণ হবে। যেমন: বিদ্বান, বিদ্বেষ, দ্বাপর।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমির সুপারিশ ও বানানের নিয়ম জনগ্রাহ্য হতে পেরেছে। এসব নিয়মে ফলাচিহ্নের নিয়ে বিশেষ কোনো মত প্রদান করা হয়নি। অর্থাৎ, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ফলাযুক্ত শব্দের প্রচলিত বানানকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য উদ্যোগে যেসব বৈপ্লবিক সুপারিশ করা হয়েছে, তা নানা কারণে গৃহীত হয়নি।

৯. ব্যুৎপত্তিমূলক বানান ও উচ্চারণমূলক বানান

ধ্বনিভিত্তিক বানানের বড় সুবিধা – বানান-সূত্র এখানে প্রায় অকার্যকর; অর্থাৎ বানানের সূত্র ছাড়াই বানান প্রায় অনায়াসে লেখা যায়। কিন্ত এর বড় সমস্যা হলো – অঞ্চলভেদে বানান এক রকম থাকে না; আবার লিখিত রূপের চেয়ে মৌখিকরূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে বানানের আদল বা চেহারাও বার বার পালটাতে থাকবে। অন্যদিকে ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সুবিধা হলো – বানানের কাঠামোর মধ্যে ধরা থাকে অনেক শব্দের ইতিহাস, গঠন, রূপ-রূপান্তর, অর্থান্তরের নানা ইঙ্গিত ও সূত্র। ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সমস্যা এখানে যে, তা আয়াসসাধ্য এবং বানান-সূত্রের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রিত।

বানান যেহেতু মূলত লেখ্যরীতির ব্যাপার, মৌখিকরীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কতটুকু থাকবে, কিংবা অসামঞ্জস্য কতটুকু হবে তা দীর্ঘদিনের প্রয়োগরীতিই নির্ধারণ করে দেয়। আমরা লক্ষ করেছি, ফলাচিহ্নযুক্ত বাংলা শব্দকে পুরোপুরি উচ্চারণানুগ করে ফেলা সম্ভব নয়। আর বানানের ব্যুৎপত্তিগত রূপের প্রাধান্য আমরা কতটুকু দেব, এটি কেবল পণ্ডিতী তর্ক নয়; কারণ, বানান-ব্যবহারকারী শব্দের ব্যুৎপত্তিকে মাথার রেখে প্রায় কোনো ক্ষেত্রে শব্দ লেখেন না।

ব্যুৎপত্তি-অনুসারী আর উচ্চারণ-অনুসারী – এ দুইয়ের মিশ্রণের কারণে বাংলা বানান-পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা থেকে গেছে। তৎসম শব্দের জন্য এক বিধি আর অন্য শব্দের জন্য অন্য বিধি প্রণয়নের ফলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়েছে। বাংলা বানান সমন্বয়ের কাজে তর্ক আবর্তিত হয়েছে মূলত তৎসম আর অ-তৎসম শব্দের বিভাজনে। অভিধান-রচয়িতাদের মধ্যে তৎসম-অতৎসম মতভেদ প্রবল – 'যে-শব্দকে কোনো অভিধানে তৎসম বলা হয়েছে, সেই শব্দকেই হয়তো অন্য অভিধানে তদ্ভব বা এমনকী কখনো বিদেশী বলে গণ্য করা হয়েছে' (সেন, ১৯৯৬: ৬৪)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনটি তৎসম আর কোনটি অতৎসম – তা শনাক্তের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই মতবিরোধ রয়েছে।

১০. সুপারিশমালা

ভাষার মৌখিক রূপের জন্য ফলাচিহ্নের বিশেষ আকৃতি কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে লিখিত ভাষার শব্দে বিচিত্র আকৃতির ফলাচিহ্ন দেখা যায়, যা বাংলা ভাষার দীর্ঘদিনের প্রথা হিসেবে চলে আসছে। এসব ফলাচিহ্নের রূপের বদল ঘটালে তা পড়ার পথে বাধা তৈরি করবে। তাছাড়া কোনো ভাষাই আকস্মিক বদলকে মেনে নিতে পারে না এবং প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই, বাংলা ফলাচিহ্নের জন্য নতুন রূপ তৈরি করার প্রয়োজন নেই, এমনকি বানানকে উচ্চারণমূলক করার নামে শব্দের বানানেও পরিবর্তন করার দরকার নেই। তবে, ফলাচিহ্নের জন্য যেসব সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে খানিক গ্রহণ-বর্জন করে বাংলা ফলাচিহ্নকে উচ্চারণমূলক বানানের পক্ষেই রাখা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির মত ও প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলা ফলাচিহ্নের জন্য কয়েকটি সুপারিশের প্রস্তাব করা হলো:

১. বিশেষ আকৃতি-সম্পন্ন লিখিত ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে ফলাচিহ্নের স্বীকৃতি দিতে হবে। যেমন: ব, ্ল, ্য, ্র। ব্যঞ্জন যুক্তবর্ণ হিসেবে থাকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ আকৃতিপ্রাপ্ত হয়; যেমন: ঙ (অঙ্ক, বঙ্গ), ঞ (পঞ্চ, বিজ্ঞ), ট (ঠাট্টা), ণ (অপরাহ্ণ, কৃষ্ণ), ত (উত্থান), ধ (বন্ধ), ন (চিহ্ন), হ (হ্ম) ইত্যাদি। সেগুলোকে স্বচ্ছ ও মূল বর্ণের আকৃতিতে স্পষ্ট করতে হবে। তাহলে, রেফ (´) বাদে সব ক্ষেত্রেই বিশেষ আকৃতির মাধ্যমে ফলাচিহ্নকে আলাদা করা সম্ভব হবে।

২. বাংলা ফলাচিহ্নের সংখ্যা হবে চারটিঃ ব-ফলা (্ব), ম-ফলা (্ম), য-ফলা (্য), র-ফলা (্র)। আকৃতিগত ও উচ্চারণগত বিশেষ ধরনের কারণে এগুলোকে ফলা হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রচলিত অন্য ফলা দুটিকে (ন-ফলা, ল-ফলা) মূলবর্ণের আকৃতিতে লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে এগুলোর আকৃতি ও উচ্চারণ মূলবর্ণের অনুরূপ থাকবে। তাই ন-ফলা, ল-ফলা বলে কিছু থাকবে না।

৩. বাংলা ফলাচিহ্নগুলোকে নতুন আকৃতি দেওয়ার দরকার নেই। প্রচলিত বিশেষ আকৃতির মাধ্যমে ফলাচিহ্নগুলোকে আলাদা করে চেনা যাবে; যেমনঃ স্ব, স্ম, স্য, স্র। মাত্রাছাড়া ব (্ব) দিয়ে ব-ফলা, খণ্ডিত ম (্ম) দিয়ে ম-ফলা, পাশে থাকা বাঁকানো দাগ (্য) দিয়ে য-ফলা ও নিচে বাঁকানো দাগ (্র) দিয়ে র-ফলা চিহ্নিত হবে। ব, ম, য, র পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হলে এগুলোকে মূল ব্যঞ্জন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৪. ফলাচিহ্ন যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হবে তার আকৃতি অপরিবর্তিত থাকবে; যেমনঃ ক্য, ক্র, ত্ব, ত্র, ভ্র, ষ্ম। ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত হলে দেখতে এমন হবেঃ ক্রু, ত্রু, দ্রু, ভ্রু, শ্রু, স্ক্রু ইত্যাদি।

৫. বাংলা ব্যাকরণে এবং অভিধানে ফলাচিহ্নের জন্য উচ্চারণ-সূত্র থাকবে। কোথায় ফলাগুলো অনুচ্চারিত থাকে (যেমনঃ স্বদেশ, উচ্ছ্বাস, স্মরণ, সন্ধ্যা), কোথায় সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটায় (যেমনঃ বিশ্ব, রশ্মি, লক্ষ্মী, ধন্য, বিদ্রোহ) এবং কোথায় সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গেই উচ্চারিত হয় (যেমনঃ প্রকাশ, যন্ত্র), তা নির্দেশ করলেই হবে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত বানানকে পরিবর্তন করার দরকার নেই। বরং ফলাচিহ্নের উচ্চারণকে এই তিন সূত্রে ফেলে দিলেই চলবে।

৬. যুক্তবর্ণে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ যথাযথ থাকলে সেগুলোকে ফলাচিহ্ন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না; যেমনঃ উদ্বেগ, দিগ্বিদিক, নব্বই, বাগ্মী, সম্মতি, গুল্ম, প্লাবন, শ্লেষ ইত্যাদি। ফলাচিহ্ন হওয়ার জন্য একইসঙ্গে উচ্চারণ ও আকৃতিতে ভিন্নতা থাকতে হবে।

৭. হ-এর সাথে যুক্ত ণ (অপরাহ্ণ), ন (চিহ্ন), ল (আহ্লাদ)-কে ফলাচিহ্নের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। হ ধ্বনিগতভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝামাঝি[২]) হওয়ায় এ রকম উচ্চারণ পাওয়া স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়। তবে, হ-এর সাথে যুক্ত ব (আহ্বান), ম (ব্রহ্ম), য (বাহ্য), র (হ্রদ)-কে ফলাচিহ্ন হিসেবে মানতে হবে। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ব, ম, য, র বিশেষ উচ্চারণ ও আকৃতি-প্রাপ্ত হয়।

১১. উপসংহার

উপরের সুপারিশগুলোর বেশিরভাগই বর্তমানে বাংলা ভাষায় কার্যকর রয়েছে; ফলে এগুলো ভাষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নয়। চারটি বর্ণের বিশেষ আকৃতিকে ফলাচিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করলে এবং এগুলোর সাধারণ উচ্চারণ-সূত্র বিবেচনায় নিলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের বিভাজনের দরকার হবে না। একই বর্ণের বৈচিত্র্যময় উচ্চারণ বাংলা ভাষাতেও আছে; যেমন: এ বর্ণের উচ্চারণ অ্যা-র মতো (এগারো), ঞ বর্ণের উচ্চারণ ন-এর মতো (পঞ্চ), স বর্ণের উচ্চাণ শ-এর মতো (সকাল) ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে ব, ম, য, র বর্ণের ফলাচিহ্ন হিসেবে বিশেষ উচ্চারণ-রূপকে গ্রহণ করতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাছাড়া ফলাচিহ্ন হিসেবে ব্যবহারের সময়ে এগুলোর বিশেষ আকৃতি উচ্চারণসূত্রকে সহজ করবে। ফলে, বানানের বর্তমান রূপকে বিদ্যমান রেখেই (যেমন: অন্বয়, গ্রীষ্ম, সত্য, ত্রাস) এগুলোকে উচ্চারণমূলক বানানের সূত্রে ও পদ্ধতিতে অন্বিত করা যায়।

টীকা

১. ঢাবিপু – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথি

২. হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৬৭: ৮৬)

তথ্য-নির্দেশ

আজম, মোহাম্মদ। (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা: আদর্শ।

আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য। (২০১২)। *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ঘোষ, দেবপ্রসাদ। (২০০৭) 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান', *বানান বিতর্ক*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঘোষ, সতীশচন্দ্র। (১৯৮৪)। 'বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার', *বাঙলা ভাষা* ১ম খণ্ড (সম্পাদনা: হুমায়ুন আজাদ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, জামিল। (১৯৯৪)। *বাংলা বানান অভিধান* (সংকলিত ও সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, মুনীর। (১৯৭০)। *বাঙলা গদ্যরীতি*। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড ।

টমসন, হানা রুথ। (২০২১)। *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (অনুবাদ: স্বরোচিষ সরকার)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১১-১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (২৫ খণ্ড)। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

ডাইসন, কেতকী কুশারী। (২০০৫)। 'বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে', *ভাষাভাবনা* (সম্পাদনা: তুষারকান্তি মহাপাত্র)। কলকাতা: অবভাস।

দেবী, রাধারাণী ও দেব, নরেন্দ্র। (২০০৭)। 'চলিত ভাষার সংস্কার', *বানান বিতর্ক*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

পাল, প্রফুল্লচন্দ্র। (১৯৬৪)। 'প্রাচীন পুথিতে বানান সমস্যা' (ভূমিকা), *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির পরিচয়* (২য় খণ্ড) (সম্পাদনা: মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল)। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার। (১৯৮৪)। 'বাণান-সমস্যা', *বাঙলা ভাষা* ১ম খণ্ড (সম্পাদনা: হুমায়ুন আজাদ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ভট্টাচার্য, মিতালী। (২০১০)। *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

মামুদ, হায়াৎ। (২০০০)। *বাংলা লেখার নিয়মকানুন*। ঢাকা: প্রতীক।

মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান। (১৯৯৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মিত্র, সুধীর। (২০০৭)। 'বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ', *বানান বিতর্ক*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। (১৯৮৪)। 'বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার', *বাঙলা ভাষা* ১ম খণ্ড (সম্পাদনা: হুমায়ুন আজাদ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। (২০০৮)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

সরকার, পবিত্র। (২০০৪)। *বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সরকার, স্বরোচিষ ও অন্যান্য। (২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

সেন, অরুণ। (১৯৯৬)। *বানানের অভিধান* (বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন : একটি প্রস্তাব)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস।

সেন, সুকুমার। (১৯৭৫)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৬৭)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (১৯৭০)। *বাঙলা গদ্যরীতি*, মুনীর চৌধুরী। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড।

Grierson, G. A. (1903). *Linguistic Survey of India* (Collected & Edited) Vol. v. Calcutta: The Indian Empire.

Halhed, Nathaniel Brassey. (1778). *A Grammar of the Bengal Language*. Printed at Hoogly in Bengal.